অণুজীব
(MICROORGANISM)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

আমাদের চারদিকে কিছু জীব রয়েছে যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না, দেখতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। এদেরকে আণুবীক্ষণিক জীব বলে। যেমন- ব্যাকটেরিয়া একটি আণুবীক্ষণিক জীব। এ ইউনিটে ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

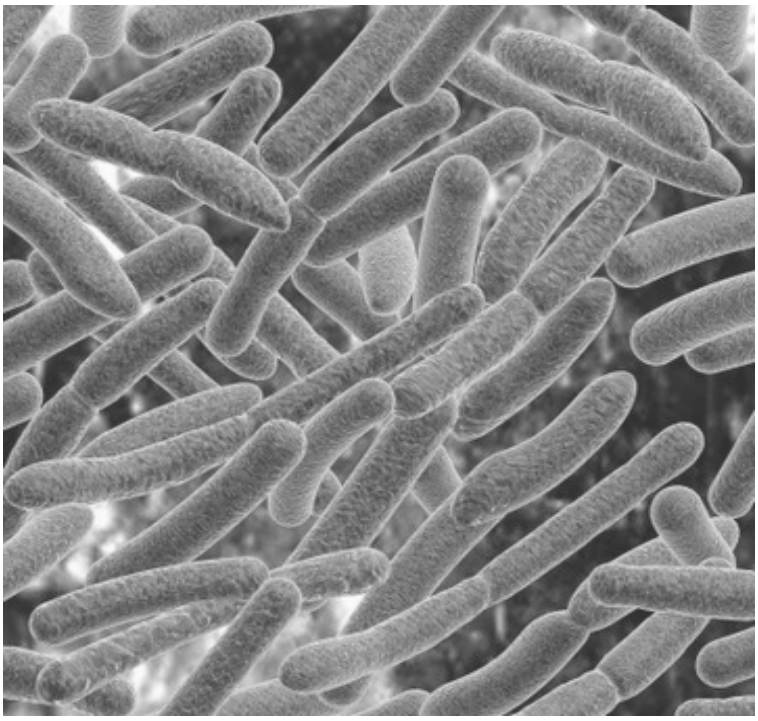

ব্যাকটেরিয়া (বহুগুণে বর্ধিত দৃশ্য)

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১ : কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

পাঠ ৬.২ : ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন

পাঠ ৬.৩ : ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব

পাঠ ৬.৪ : ধান গাছের ব্লাইট রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

পাঠ ৬.৫ : ব্যবহারিক- ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন

পাঠ-৬.১ কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন।
- কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	কক্কাস, ব্যাসিলাস, স্পাইরিলাম, কমা

গ্রিক শব্দ Bakterion = Little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দটি এসেছে। যার অর্থ ক্ষুদ্র দন্ড। ব্যাকটেরিয়া (এক বচনে ব্যাকটেরিয়াম) সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাককেন্দ্রিক এককোষী ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব। গাঠনিক উপাদান ও পুষ্টি পদ্ধতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয়।

ওলন্দাজ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফন লিউয়েন হুক ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এদের নাম দেন Animalcule অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রাণী। তাই তাকে Father of Bacteriology অর্থাৎ ব্যাকটেরিওলজির জনক বলা হয়। জার্মান বিজ্ঞানী এহরেনবার্গ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (১৮২২-১৮৯৫) ব্যাকটেরিয়ার উপর ব্যাপক গবেষণা করে ব্যাকটেরিয়া তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী জীব। ব্যাপক অর্থে ব্যাকটেরিয়া বলতে আর্কিব্যাকটেরিয়া, ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রুপকে বোঝায়। বর্তমানে মাইকোপ্লাজমাকেও ব্যাকটেরিয়া হিসেবে ধরা হয়। উপরোক্ত গ্রুপগুলোর মধ্যে আর্কিব্যাকটেরিয়া পৃথক ধরনের। ১৯৭০ সালের পূর্বে আর্কিব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯৯৬ সালে একটি আর্কিব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্সিং পর্যবেক্ষণ করার পর এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই কার্ল উজ (Carl Woese) এবং তাঁর সহযোগী (১৯৭৭) জীবরাজ্যকে তিনটি অধিরাজ্যে (Domain) ভাগ করেন যা তিন অধিরাজ্য (Three Domain) নামে পরিচিত। যথা-

অধিরাজ্য-১ : Archaea, রাজ্য- Archaebacteria।

অধিরাজ্য-২ : Bacteria, রাজ্য- Eubacteria।

অধিরাজ্য-৩ : Eukarya, রাজ্য- Protista, Fungi, Plantae, Animalia।

ব্যাকটেরিয়া মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে বাস করে। এমনকি মানুষের অন্ত্রেও ব্যাকটেরিয়া বাস করে। যেমন- *Escherichia coli*। এরা আমাদেরকে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স সরবরাহ করে। মাটি বা পানি যেখানে জৈব পদার্থ বেশি, ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও সেখানে বেশি। জৈবসমৃদ্ধ আবাদি মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে বায়ুস্তরের সবচেয়ে উঁচুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না।

ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য

ব্যাকটেরিয়া জড় কোষ প্রাচীরবিশিষ্ট এককোষী আদিকেন্দ্রিক অণুজীব। এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

১। ব্যাকটেরিয়ার আকার সাধারণত ০.২-৫০ মাইক্রোমিটার।

২। এরা আণুবীক্ষণিক জীব।

৩। এরা এককোষী, তবে একসাথে অনেকগুলো কোষ কলোনি করে বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে।

৪। এদের কোষ প্রাককেন্দ্রিক। তাই এদের কোষে রাইবোসোম ছাড়া অন্য কোন ঝিল্লীবদ্ধ অঙ্গাণু (যেমন নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি বডি, লাইসোসোম এবং সাইটোস্কেলেটন ইত্যাদি) থাকে না।

৫। এরা পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী, অধিকাংশই মৃতজীবি এবং কিছু স্বনির্ভর। এরা সাধারণত দ্বিভাজন বা বাইনারি ফিশন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

৬। এদের কোষ প্রাচীর প্রধানত পেপটিডোগ্লাইকান। এর সাথে মিউরামিক অ্যাসিড এবং টিকোয়িক অ্যাসিড থাকে।

৭। ফায ভাইরাসের প্রতি এরা সংবেদনশীল।

৮। এরা অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।

৯। এরা সাধারণত মৌলিক রং ধারণ করতে পারে। যেমন- গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ।

১০। এদের কোষে ক্রোমোসোম হিসেবে একটি দ্বিসূত্রক বৃত্তাকার DNA অণু থাকে। এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন প্রোটিন থাকে না।

১১। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াতে নিউক্লিয়ার বহির্ভূত DNA থাকে যা সাধারণত প্লাজমিড নামে পরিচিত।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি : বিভিন্ন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেনিবিন্যাস করেছেন। যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীগণ ব্যাকটেরিয়াকে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা হলো- কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির ভিন্নতা, ফ্ল্যাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা এবং স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি।

কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস : কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) কক্কাস, (খ) ব্যাসিলাস, (গ) স্পাইরিলাম এবং (ঘ) কমা আকৃতি।

(ক) কক্কাস- গোলাকার ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় কক্কাস। কক্কাস ব্যাকটেরিয়া আবার পাঁচ রকমের। যথা-

১। মাইক্রোকক্কাস, ২। ডিপ্লোকক্কাস, ৩। স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ৪। স্ট্রেপটোকক্কাস এবং ৫। সারসিনা।

মাইক্রোকক্কাস- যে সব গোলাকার ব্যাকটেরিয়া এককভাবে অবস্থান করে তাকে মাইক্রোকক্কাস বলে।

উদাহরণ- *Micrococcus denitrificans*।

ডিপ্লোকক্কাস- যে সব গোলাকার ব্যাকটেরিয়া জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাদেরকে ডিপ্লোকক্কাস বলে।

উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae*।

স্ট্যাফাইলোকক্কাস- যে সব গোলাকার ব্যাকটেরিয়া অনিয়মিত গুচ্ছাকারে সাজান থাকে তাকে স্ট্যাফাইলোকক্কাস বলে।

উদাহরণ- *Staphylococcus aureus*।

স্ট্রেপটোকক্কাস- যে সব গোলাকার ব্যাকটেরিয়া চেইনের মত সাজানো থাকে তাকে স্ট্রেপটোকক্কাস বলে।

উদাহরণ- *Streptococcus lactis*।

সারসিনা- যে সকল গোলাকার ব্যাকটেরিয়া নিয়মিত দলে অবস্থান করে সমান সমান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘন তলের মত গঠন করে তাদেরকে সারসিনা বলে।

উদাহরণ- *Sarcina lutea*।

Micrococcus denitrificans

Diplococcus pneumoniae

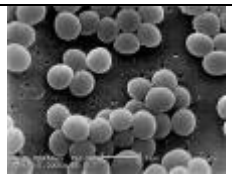

Staphylococcus aureus

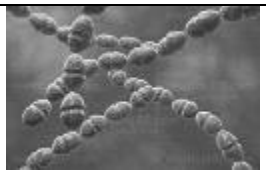

Streptococcus lactis

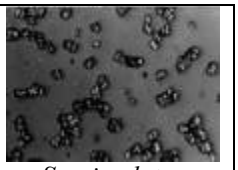

Sarcina lutea

Bacillus subtilis

Spirillum

Comma ব্যাকটেরিয়া

চিত্র ৬.১ : আকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া

(খ) ব্যাসিলাস- দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। উদাহরণ- *Bacillus subtilis, B. ulbus, B. anthracis* ইত্যাদি।

(গ) স্পাইরিলাম- কুন্ডলাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Spirillum volutans, S. minus* ইত্যাদি।

(ঘ) কমা- কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে কমা ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। উদাহরণ- *Vibrio cholerae*।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে আকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রকারের ব্যাকটেরিয়ার একটি করে উদাহরণ দিন (বৈজ্ঞানিক নাম)			

সারসংক্ষেপ

ব্যাকটেরিয়া (এক বচনে ব্যাকটেরিয়াম) সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাককেন্দ্রিক এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব। গাঠনিক উপাদান ও পুষ্টি পদ্ধতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয়। কার্ল উজ (Carl Woese) এবং তাঁর সহযোগী ১৯৭৭ সালে জীবরাজ্যকে তিনটি অধিরাজ্যে (Domain) ভাগ করেন যা তিন অধিরাজ্য (Three Domain) নামে পরিচিত। যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীগণ ব্যাকটেরিয়াকে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা হলো- কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির ভিন্নতা, ফ্ল্যাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা এবং স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি। কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) কক্কাস, (খ) ব্যাসিলাস, (গ) স্পাইরিলাম এবং (ঘ) কমা আকৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কার্ল উজ ও তাঁর সহযোগী জীবরাজ্যকে কয়টি অধিরাজ্যে বিভক্ত করেন ?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

২। ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

i. এরা আণুবীক্ষণিক জীব
ii. এরা পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী
iii. ফায ভাইরাসের প্রতি এরা সংবেদনশীল

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৬.২ ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার জনন সচিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	বাইনারি ফিশন, মেরোজাইগোট, প্লাজমিড

একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষের গঠন : ব্যাকটেরিয়ার গঠন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো- একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষে সাধারণত যে সকল অংশগুলো থাকে তা হলো- (ক) ফ্ল্যাজেলা, (খ) ক্যাপসিউল, (গ) কোষ প্রাচীর, (ঘ) প্লাজমামেমব্রেন, (ঙ) মেসোসোম, (চ) সাইটোপ্লাজম, (ছ) ক্রোমোসোম এবং (জ) প্লাজমিড।

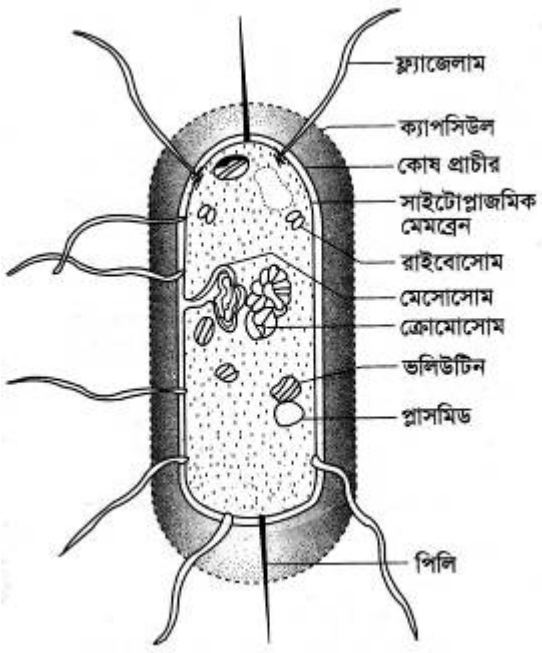

চিত্র ৬.২.১ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষের গঠন

ফ্ল্যাজেলা- ফ্ল্যাজেলা প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত এক প্রকার সূত্রাকৃতির উপাঙ্গ যা কোষ প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যাজেলা গঠিত। ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া তরল মাধ্যমে চলাফেরা করে। ফ্ল্যাজেলা অপেক্ষা খাটো ও শক্ত উপাঙ্গকে পিলি বলে। পিলি পিলিন নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ব্যাকটেরিয়াকে কোন কিছুর সাথে আটকে থাকতে পিলি সহায়তা করে।

ক্যাপসিউল- ক্যাপসিউল পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি স্তর, যা ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরের দিকে থাকে। এটি কোষ প্রাচীরকে ঘিরে রাখে। একে স্লাইম স্তরও বলা হয়। এটি ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা করে।

কোষ প্রাচীর- ক্যাপসিউলের নিচেই জড় কোষ প্রাচীর অবস্থিত। কোষ প্রাচীর পেপটিডোগ্লাইকান দিয়ে গঠিত। কোষ প্রাচীর সাধারণত ১০-২৫μm (মাইক্রোমিটার) পুরু হয়। এটি ব্যাকটেরিয়া কোষের নির্দিষ্ট আকার ও দৃঢ়তা দান করে। কোষ প্রাচীরে প্রায় ১μm ব্যাসের অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এ সমস্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক পদার্থসমূহ চলাচল করে।

সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন- কোষ প্রাচীরের ঠিক নিচে সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অবস্থান করে। এটি একটি সজীব ঝিল্লী। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে গঠিত। এর সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অনেক মেটাবোলিক কাজ করে।

মেসোসোম- ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অনেক সময় ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়। একে মেসোসোম বলা হয়। এটি কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

সাইটোপ্লাজম- সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম থাকে। এটি সাধারণত বর্ণহীন। এতে কোষ গহবর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন যার অধিকাংশই এনজাইম, বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ যেমন- ফসফরাস, লৌহ ও সালফার ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে কিছু পদার্থ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। যেমন- ১। রাইবোসোম (70S), ২। ক্রোম্যাটোফোর, ৩। কোষ গহ্বর এবং ৪। ভলিউটিন।

১। রাইবোসোম- প্রতিটি রাইবোসোম RNA ও প্রোটিন সহযোগে গঠিত। প্রোটিন সংশ্লেষণ করাই রাইবোসোমের প্রধান কাজ।

২। ক্রোম্যাটোফোর- কতক ব্যাকটেরিয়াতে ক্রোম্যাটোফোর থাকে। এসব রঞ্জক পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে।

৩। কোষ গহ্বর- ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে অত্যন্ত ছোট ছোট কোষ গহবর থাকে।

৪। ভলিউটিন- তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে এবং পুরাতন কোষের কোষ গহ্বরে ভলিউটিন থাকে।

ক্রোমোসোম- সাইটোপ্লাজমে কেবলমাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে। এটি প্রায় বৃত্তাকার DNA অণু। এটি নগ্ন কারণ এতে কোন হিস্টোন প্রোটিন থাকে না। তাছাড়া ক্রোমোসোমকে ঘিরে নিউক্লিয়ার আবরণীও থাকে না। DNA অণুসমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিউক্লিয়োয়েড বলা হয়। এটি কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

প্লাজমিড- কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন- *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে নিউক্লিয়োয়েড ছাড়াও অতিরিক্ত ছোট প্রকৃতির বৃত্তাকার DNA থাকে যাকে প্লাজমিড বলে। প্লাজমিডযুক্ত ব্যাকটেরিয়া জিন প্রকৌশলে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

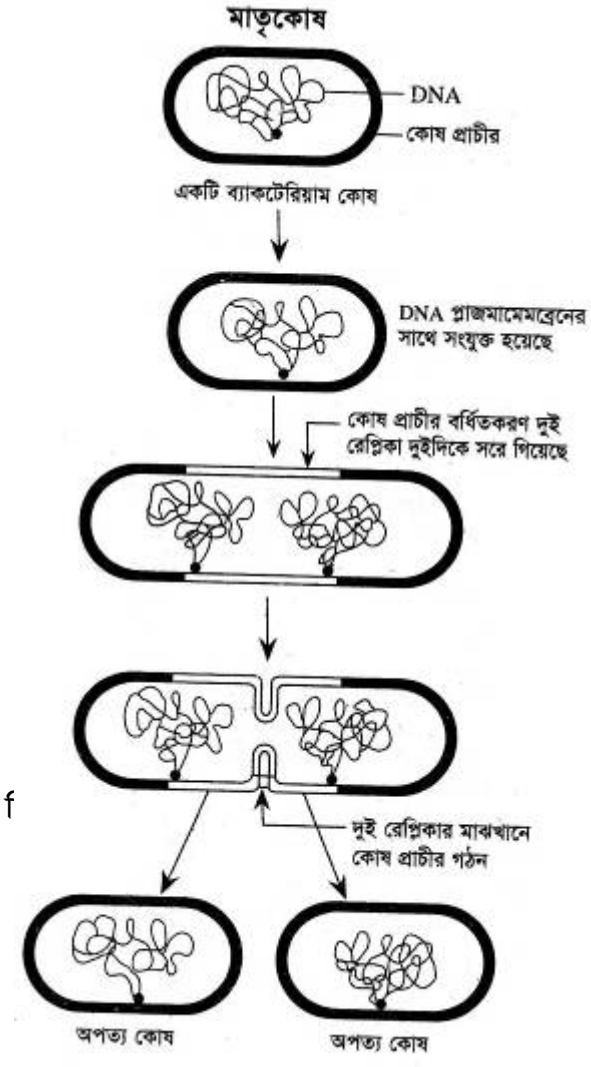

ব্যাকটেরিয়ার জনন : ব্যাকটেরিয়া দুটি প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে। যেমন- অযৌন জনন এবং যৌন জনন।

অযৌন জনন : ব্যাকটেরিয়া সাধারণত অযৌন প্রক্রিয়ায় দ্বিভাজন বা বাইনারি ফিশন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

দ্বিভাজন পদ্ধতি

দ্বিভাজন ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক, অত্যন্ত সরল এবং দ্রুততম জনন প্রক্রিয়া। দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। দ্বিভাজন পদ্ধতিটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১। এ প্রক্রিয়ার প্রথমেই ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম তথা DNA ব্যাকটেরিয়া কোষের দু'প্রান্তের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান নেয়।

২। এরপর প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত হয় এবং প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় DNA অণুর প্রতিলিপন হয়।

৩। এ অবস্থায় কোষটি লম্বায় বৃদ্ধি পায়। কোষ প্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেনের বৃদ্ধি কোষের দু'প্রান্তের মাঝখানে ঘটে। কোষ প্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেন লম্বায় বৃদ্ধির কারণে DNA রেপ্লিকা দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে কোষের দু'প্রান্তে অবস্থান নেয়।

৪। এরপর কোষের মাঝখানে প্লাজমামেমব্রেন ক্রমশ ভেতরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্লাজমামেমব্রেনের বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ অংশে কোষ প্রাচীর সংশ্লেষিত হয়। এক সময় একটি কোষ দুটি কোষে পরিণত হয়।

৫। শেষ পর্যায়ে টার্গার প্রেসার অর্থাৎ স্ফীতি চাপের কারণে নতুন সৃষ্ট কোষ দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়। নতুন সৃষ্ট কোষ দুটিকে অপত্য কোষ বলে। অপত্য কোষ দুটি পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃ কোষের সমান আয়তন লাভ করে এবং এরা আবার দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াতে দ্বিভাজন পদ্ধতি ঘটে। নতুন সৃষ্ট কোষ দুটি বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে এটি আবার বিভক্ত হতে পারে এবং এ কারণেই ডিপ্লোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বিভাজনের জন্য সাধারণত ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হয়। উপযুক্ত পরিবেশে আমাদের অন্ত্রে অবস্থানকৃত *E. coli* ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে। এ পদ্ধতি চলতে থাকলে একদিনে *E. coli* এর ৭২ টি জেনারেশন সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব নয় কারণ কয়েক জেনারেশন বৃদ্ধির পর এদের খাবার ঘাটতি দেখা দেয়। এদের বর্জ্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে। তাই প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট সময় পর বন্ধ হয়। আর প্রক্রিয়াটি এ রকম চলতে থাকলে এক সময় পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার পুরু স্তর জমা হত। ফলে পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেত।

যৌন জনন : ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জননের হার অত্যন্ত কম। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেডারবার্গ ও টেটাম নামক গবেষকদ্বয় *Escherichia coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে সর্বপ্রথম যৌন জনন আবিষ্কার করেন। ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে বংশগত বিষয়ক চরিত্রাবলীর বিনিময় ও পুনর্বিন্যাস ঘটলেও ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

এ প্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ একটি দাতা কোষ (+) এবং অপরটি গ্রহীতা কোষ (-) একত্রে এসে পাশাপাশি অবস্থান করে। এ সময় কোষ দুটির মাঝখানে কনজুগেশন নালী তৈরি হয়। কনজুগেশন নালীর মধ্য দিয়ে দাতা কোষের ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করতে শুরু করে। তবে দাতা কোষের সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হবার পূর্বেই কোষ দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে গ্রহীতা কোষ দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোম লাভ করে।

আংশিক ক্রোমোসোম লাভ করার ফলে গ্রহীতা কোষে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় তাকে অসম্পূর্ণ জাইগোট বা **মেরোজাইগোট** বলা হয়। মেরোজাইগোট গঠন করার পর গ্রহীতা কোষটি দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া কোষের কোন সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না বরং দাতা কোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অচিরেই বিনষ্ট হয়। ফলে সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই এ প্রক্রিয়াকে জনন প্রক্রিয়া না বলে রিকম্বিনেশন বলাই উত্তম।

চিত্র ৬.২.৩ : ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষের বিভিন্ন অংশের নামগুলো লিখুন

সারসংক্ষেপ

একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষে সাধারণত যে সকল অংশগুলো থাকে তা হলো- (ক) ফ্ল্যাজেলা, (খ) ক্যাপসিউল, (গ) কোষ প্রাচীর, (ঘ) প্লাজমামেমব্রেন, (ঙ) মেসোসোম (চ) সাইটোপ্লাজম, (ছ) ক্রোমোসোম এবং (জ) প্লাজমিড। ব্যাকটেরিয়া দুটি প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে। যেমন- অযৌন জনন এবং যৌন জনন। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত অযৌন প্রক্রিয়ায় দ্বিভাজন বা বাইনারি ফিশন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কোন প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন সম্পন্ন করে ?

(ক) বাইনারি ফিশন (খ) ফিশন (গ) ফিউশন (ঘ) বাইনারি ফিউশন

২। কোন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়াতে সর্বপ্রথম যৌন জনন আবিষ্কার করেন ?

(ক) লেডারবার্গ ও টেটাম (খ) লেডারবার্গ (গ) টেটাম (ঘ) লেডার

৩। নিচের অংশগুলো একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামে পাওয়া যায়-

i. ফ্ল্যাজেলা ii. ক্যাপসিউল iii. প্লাজমিড

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৪। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে ঘটে-

i. বংশগত চরিত্রাবলীর বিনিময় ii. বংশগত চরিত্রাবলীর পুনর্বিন্যাস

iii. ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৬.৩ ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	অ্যান্টিবায়োটিক, টিকা, নাইট্রোজেন সংবন্ধন

ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব : মানব জীবনে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতিকর কার্যকলাপই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ব্যাকটেরিয়াকে শত্রু মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া আমাদের শত্রু নয়। এরা আমাদের অনেক উপকারও করে। তাহলে বলতে পারি ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার এবং অপকার দুটোই করে। উভয় প্রকার গুণাবলির জন্য ব্যাকটেরিয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা এবং (খ) ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা।

(ক) ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

ব্যাকটেরিয়া যে সব ক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো- ১। চিকিৎসাক্ষেত্রে, ২। কৃষিক্ষেত্রে, ৩। শিল্প, ৪। মানব জীবন এবং ৫। পরিবেশ উন্নয়ন।

১। চিকিৎসাক্ষেত্রে

অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতে- ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন এবং পলিমিক্সিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয়।

যেমন- *Bacillus subtilis* হতে সাবটিলিন এবং *Bacillus polymyxa* হতে পলিমিক্সিন প্রস্তুত করা হয়।

প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে- ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি. রোগের প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। যেমন- *Corynebacterium diptheriae* (D), *Bordetalla pertussis* (P) এবং *Clostridium tetani* (T) এ তিনটি শব্দের সমন্বয়ে DPT নামকরণ করা হয়েছে।

২। কৃষিক্ষেত্রে

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয়ে ব্যাকটেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া মাটির উপাদান হিসেবেও কাজ করে। নানাবিধ আবর্জনা হতে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার এবং জৈব গ্যাস প্রস্তুত করে।

নাইট্রোজেন সংবন্ধনে- *Azotobacter, Pseudomonas, Clostridium* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগ পদার্থ হিসেবে স্থাপন করে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

পতঙ্গনাশক হিসেবে- কোন কোন ব্যাকটেরিয়া লেপিডোপটেরা (*Lepidoptera*) ও অন্যান্য পতঙ্গের লার্ভা আক্রমণ করে এবং সেগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে। যেমন- *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

ফলন বৃদ্ধিতে- কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং গমের উৎপাদন শতকরা ২০.৮ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

৩। শিল্পক্ষেত্রে

চা, কফি এবং তামাকজাত প্রক্রিয়াকরণে- চা, কফি এবং তামাকজাত প্রক্রিয়াকরণে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুগ্ধজাত শিল্পে- দুগ্ধ হতে মাখন, দই, পনির প্রভৃতি তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কারণ এসব খাদ্যের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ ব্যাকটেরিয়ার গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

পাট শিল্পে- ব্যাকটেরিয়াজনিত পঁচন ক্রিয়ার ফলেই পাটের কান্ড থেকে আঁশগুলো পৃথক হয়। ফলে আমরা পাটের আঁশ পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে *Clostridium* ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চামড়া শিল্পে- চামড়া হতে লোম ছড়াতে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জৈব গ্যাস তৈরিতে- জৈব গ্যাস তৈরিতে এবং হেভী মেটাল পৃথকীকরণেও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

টেস্টিং সল্ট প্রস্তুতিতে- টেস্টিং সল্ট প্রস্তুতিতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু এবং মুখরোচক করতে এ সল্ট ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকরণে- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- ভিনেগার তৈরিতে *Acetobacter xylinum* কে ব্যবহার করা হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরিতে *Bacillus lacticacidi* কে ব্যবহার করা হয় এবং অ্যাসিটোন তৈরিতে *Clostridium acetobutylicum* কে ব্যবহার করা হয়।

৪। মানব জীবনে

সেলুলোজ হজমে- গবাদি পশু ঘাস, খড় প্রভৃতি খায়। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

ভিটামিন তৈরিতে- মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী *Escherichia coli, Aerobacter aerogenes* এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াগুলো ভিটামিন 'বি', থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, বায়োটিন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-কে ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

জিন প্রকৌশল- জিন প্রকৌশলে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। যেমন- *Escherichia coli* জিন প্রকৌশলে বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫। পরিবেশ উন্নয়ন

আবর্জনা পঁচন- উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ ও বর্জ্য পদার্থ পঁচনে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পয়ঃনিষ্কাশনে- জৈব বর্জ্য পদার্থকে দ্রুত রূপান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া পয়ঃপ্রণালিকে সুষ্ঠু ও চালু রাখে।

তেল অপসারণে- সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

(খ) ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা

১। মানুষের রোগ সৃষ্টি- মানুষের অধিকাংশ মারাত্মক রোগ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রোগ নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ঘটে থাকে। যেমন-

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়ার নাম
যক্ষ্মা	*Mycobacterium tuberculosis*
নিউমোনিয়া	*Diplococcus pneumoniae*
টাইফয়েড	*Salmonella typhosa*
কলেরা	*Vibrio cholerae*
ডিপথেরিয়া	*Corynebacterium diptheriae*
আমাশয়	*Bacillus dysenteri*
ধনুষ্টংকার	*Clostridium tetani*
হুপিংকাশি	*Bordetalla pertussis*

২। গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর রোগ সৃষ্টি- ব্যাকটেরিয়া গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

নানা ধরনের রোগের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া দায়ী। যেমন-

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়ার নাম
গরু-মহিষের যক্ষ্মা	*Mycobacterium bovis*
হাঁস-মুরগির কলেরা	*Bacillus avisepticus*
ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স	*Bacillus anthracis*
গলাফোলা	*Pasturella multocida*
ইঁদুরের প্লেগ	*Yersinia pestis*

৩। উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি- ব্যাকটেরিয়া একদিকে যেমন প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে অপরদিকে তেমন উদ্ভিদের মারাত্মক রোগও সৃষ্টি করে থাকে। যেমন-

রোগের নাম	ব্যাকটেরিয়ার নাম
ধানের পাতা ধ্বসা	*Xanthomonas oryzae*
গমের টুন্ডু রোগ	*Agrobacterium tritici*
লেবুর ক্যাঙ্কার	*Xanthomonas citri*
আলুর বাদামী পঁচা	*Pseudomonas solanacearum*
আলুর রিং রট	*Corynebacterium sepidonicum*

৪। খাদ্য দ্রব্যের পঁচন ও বিষাক্তকরণ- ব্যাকটেরিয়া নানা রকম টাটকা ও সংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্যের পঁচন ঘটিয়ে আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। যেমন *Clostridium botulinum* নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে বটুলিন নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। এতে মানুষের দেহে বটুলিজম রোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

৫। পানি দূষণ- বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া পানিকে দূষিত করে এবং দূষিত পানি নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। যেমন- কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডায়রিয়া প্রভৃতি দূষিত পানি পানের মাধ্যমে হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া যেমন কলিফর্ম, ফিকাল কলিফর্ম, *Salmonella, Shigella, Bacillus, Pseudomonas, Vibrio, Escherichia coli* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া পানি দূষিতকরণের জন্য দায়ী।

৬। মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্টকরণ- নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কিন্তু কতিপয় ব্যাকটেরিয়া মাটিস্থ নাইট্রেটকে ভেঙ্গে মুক্ত নাইট্রেটে পরিণত করে মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।

৭। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষতিসাধন-ব্যাকটেরিয়া কাপড় চোপড়, কাঠের আসবাবপত্রসহ অনেক দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করে।

৮। যুদ্ধ ক্ষেত্রে- যুদ্ধে ক্ষতিকারক জীবাণুর ব্যবহার মানব জাতীর জন্য দারুণ হুমকীস্বরূপ। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে এমন পাঁচটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখুন			

সারসংক্ষেপ

মানব জীবনে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতিকর কার্যকলাপই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ব্যাকটেরিয়াকে শত্রু মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া আমাদের শত্রু নয়। এরা আমাদের অনেক উপকারও করে। তাহলে বলতে পারি ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার এবং অপকার দুটোই করে। উভয় প্রকার গুণাবলির জন্য ব্যাকটেরিয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা এবং (খ) ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। কলেরা সৃষ্টি করে নিচের কোন জীবাণু ?

(ক) *Vibrio cholera* (খ) *Salmonella typhosa*

(গ) *Bacillus dysenteri* (ঘ) *Clostridium tetani*

২। নিচের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে -

i. কৃষিক্ষেত্রে ii. শিল্পক্ষেত্রে iii. পরিবেশে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ ধান গাছের ব্লাইট রোগের কারণ,লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্লাইট বা মড়ক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধান গাছের ব্লাইট রোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধান গাছের ব্লাইট রোগের লক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধান গাছের ব্লাইট রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	ব্লাইট, লক্ষণ

সকল ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে রোগ উৎপাদন করে না। যে সকল ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে তাদের অধিকাংশই *Xanthomonas, Erwinia* এবং *Pseudomonas* গণের প্রজাতিসমূহ। এছাড়াও *Streptomyces, Corynebacterium, Agrobacterium* গণের কিছু প্রজাতিও উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে। এ সকল ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে প্রধানত ব্লাইট, পাতার দাগজনিত রোগ, নরম পঁচা, গল, ক্যাঙ্কার, ঢলে পড়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে।

চিত্র ৬.৪.১ : রোগাক্রান্ত পাতা

ব্লাইট বা মড়ক : এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে গাছের কিছু কিছু অংশ খুব দ্রুত বিবর্ণ হয়। ফলে রোগাক্রান্ত গাছগুলো মরে যায়। অনেক সময় মৃত অংশ পঁচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। একে ব্লাইট বা মড়ক বলা হয়। যেমন- ধানের পাতা ধ্বসা রোগ। এটির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হলো- *Xanthomonas oryzae*।

ধান গাছের ব্লাইট রোগ : ধানের যতগুলো মারাত্মক রোগ রয়েছে তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপি এর বিস্তৃতি। জাপানের কৃষকরা সর্বপ্রথম ধানের ব্লাইট রোগের সন্ধান পান। প্রথমদিকে তারা মনে করতো পরিবেশজনিত কোন কারণে এ রোগটি হয়।

কিন্তু পরে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ধান গাছের ব্লাইট রোগ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে এ রোগের অস্তিত্ব প্রথম পাওয়া যায় ১৯৬৬ সালে রোপা আমন ধানে। এ রোগের প্রকোপের মাত্রা অনুযায়ী ধানের ফলন ৬-৬০% কমে যায়।

চিত্র ৬.৪.২ : রোগাক্রান্ত ধানের শীষ

ধান গাছের ব্লাইট রোগের কারণ : Takaeshi ১৯০৮ সালে প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। পরে আরও অনেকে এ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করেন। ধান গাছের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম *Xanthomonas oryzae* pv *oryzae* (Ishasyama) Swings *et al*.। এরা বিভিন্ন ঘাস এবং বুনো ধান গাছকে বিকল্প পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বাঁচে। একাধিক উৎস থেকে রোগের উৎপত্তি হতে পারে। যেমন- রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড়, পাতার ক্ষত স্থান, কাঁটা স্থান, পানিরন্ধ্র বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে জীবাণু গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরে জীবাণু পাতার শিরার ভেতরে প্রবেশ করে। মূলের ভেতরে প্রবেশ করলে পানি প্রবাহ বন্ধ হয় এবং গাছ নেতিয়ে পড়ে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা যেমন ২৫-৩০°সে. , উচ্চ জলীয় বাষ্প, বৃষ্টি, জমিতে অধিক পানি ব্লাইট রোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগও রোগ বিস্তারে অনুকূল থাকে।

ধান গাছের ব্লাইট রোগের লক্ষণ : লক্ষণ হলো রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একটি গাছের বিশেষ কোন অংশ রোগাক্রান্ত হলে ঐ অংশের কোষগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। ফলে গাছে রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। সাধারণত রোগ লক্ষণ পাতায় সীমিত থাকে। ধান গাছের ক্ষেত্রে ব্লাইট রোগের লক্ষণগুলো হলো-

১। গ্রীষ্মকালে সাধারণত ধানের ছড়া বের হবার সময় এ রোগ দেখা দেয়।

২। প্যাথোজেনের আক্রমণে প্রথমে পাতায় ভেজা, অর্ধস্বচ্ছ এবং লম্বা লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়।

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার কিনারা দিয়ে দাগের সূচনা হয় এবং রোগের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে দাগগুলো পাতার নিচের দিকে প্রসারিত হয়। এ সময় দাগগুলো ঢেউ খেলানো প্রান্তবিশিষ্ট হয়।

৪। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে হলুদ বা হলদে সাদা এবং পরবর্তীতে স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষতস্থান ধূসর হয়।

৫। সকালে আক্রান্ত স্থান থেকে দুধের ন্যায় সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস ধীরে প্রবাহিত হয়।

৬। পাশাপাশি অনেকগুলো দাগ একত্রিত হলে একটি বড় দাগের সৃষ্টি হয়।

৭। আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায়।

৮। চারা লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এ অবস্থায় আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।

৯। পাতার উপর সাদা আঠালো এক প্রকার রস জমতে থাকে।

১০। ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয় ফলে ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

ধান গাছের ব্লাইট রোগের প্রতিকার

১। জমিতে নাইট্রোজেন সার সময়মত এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে।

২। ক্ষেতে কপার অক্সিক্লোরাইড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে রোগের প্রকোপ কম হবে।

৩। ক্ষেতে পানি সেচের সময় উহার সাথে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

৪। ব্লিচিং পাউডার (পরিমাণ মত) এবং জিঙ্ক সালফেট দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে। কারণ বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন।

৫। অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়।

ধান গাছের ব্লাইট রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১। সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উন্নত জাতের প্রকরণ চাষ করা।

২। বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেতের আগাছা বিনাশ করতে হবে। এমনকি বপনের পরও যাতে ক্ষেতে কোন প্রকার আগাছা জন্মাতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কারণে জমিতে আগাছা জন্মালে সেগুলো এমনভাবে বিনষ্ট করতে হবে যাতে ধান গাছের কোন ক্ষতি না হয়।

৩। বীজ বুনা বা চারা লাগানোর পূর্বে জমিকে ভালভাবে শুকাতে হবে এবং পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নিজ থেকে গজানো চারা জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪। বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে। অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্মতভাবে হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে উদ্ভিদের রোগ উৎপন্ন করে এমন তিনটি ব্যাকটেরিয়া গণের নাম লিখুন	

সারসংক্ষেপ

যে সকল ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে তাদের অধিকাংশই *Xanthomonas, Erwinia* এবং *Pseudomonas* গণের প্রজাতি। এছাড়াও *Streptomyces, Corynebacterium, Agrobacterium* গণের কিছু প্রজাতিও উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে। এরা উদ্ভিদের প্রধানত ব্লাইট, পাতার দাগজনিত রোগ, নরম পঁচা, গল, ক্যাঙ্কার, ঢলে পড়া প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে গাছের কিছু কিছু অংশ খুব দ্রুত বিবর্ণ হয়। ফলে রোগাক্রান্ত গাছগুলো মরে যায়। অনেক সময় মৃত অংশ পঁচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। একে ব্লাইট বা মড়ক বলা হয়। যেমন- ধানের পাতা ধ্বসা রোগ। এর জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হলো- *Xanthomonas oryzae*। ধানের যতগুলো মারাত্মক রোগ রয়েছে তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপি এর বিস্তৃতি। জাপানের কৃষকরা সর্বপ্রথম ধানের ব্লাইট রোগের সন্ধান পান। Takaeshi ১৯০৮ সালে প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। পরে আরও অনেকে এ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করেন। ধান গাছের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম *Xanthomonas oryzae* pv *oryzae* (Ishasyama) Swings *et al*.।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ধানের পাতা ধ্বসা রোগের জন্য দায়ী অণুজীবটি কী ?

(ক) ব্যাকটেরিয়া (খ) ভাইরাস (গ) শৈবাল (ঘ) ছত্রাক

২। ধানের পাতা ধ্বসা রোগের জন্য দায়ী নিচের কোনটি ?

(ক) *Xanthomonas oryzae* (খ) *Xanthomonas* (গ) *Erwinia* (ঘ) *Pseudomonas*

ব্যবহারিক- ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টক দই থেকে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের উপকরণগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	গোলাকার ব্যাটেরিয়া, দন্ডাকার ব্যাকটেরিয়া

পরীক্ষার নাম : টক দই থেকে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন।

তত্ত্ব : কিছু ব্যাকটেরিয়ার জৈবিক বিক্রিয়ার ফলে দুধ থেকে দই পাওয়া যায়। এজন্য দইতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হয়।

উপকরণ : কিছু পরিমাণ টক দই, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, পরিস্রুত পানি, স্পিরিট ল্যাম্প, একটি টেস্টটিউব, ড্রপার, কাচের স্লাইড, নিডল, স্যাফ্রানিন, পানি এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কর্মপদ্ধতি

(ক) প্রথমে একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে সামান্য পরিমাণ টক দই নিন। এতে পরিমাণ মত পরিস্রুত পানি মিশিয়ে ভালভাবে কিছু সময় ঝাঁকাতে থাকুন।

(খ) এরপর ফ্লাস্কটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখুন যাতে হালকা গরম হয়। এরপর ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফ্লাস্কটিকে ১০-১৫মিনিট রেখে দিন। ঠান্ডা হওয়ার পর ফ্লাস্কের দইয়ে দুটি অংশ দেখা যাবে। যেমন- ১। তলানি হিসেবে দইয়ের ঘন অংশ এবং ২। উপরের জলীয় অংশ। এরপর জলীয় অংশটুকু একটি টেস্টটিউবে ঢেলে নিন। টেস্টটিউবের জলীয় অংশই ব্যাকটেরিয়ার নমুনা।

(গ) টেস্টটিউব থেকে ড্রপারের সাহায্যে এক ড্রপ নমুনা (ব্যাকটেরিয়ার নমুনা) নিন। একটি পরিস্কার স্লাইডের মধ্যখানে নমুনাটি রাখুন। একটি নিডলের মাধ্যমে তরল নমুনাটুকু স্লাইডে ছড়িয়ে দিন।

(ঘ) নমুনাটুকু বাতাসে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকানো নমুনাসহ স্লাইডটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর দিয়ে কয়েকবার আনা-নেয়া করুণ। এতে শুকানো নমুনার স্তরটি স্লাইডের গায়ে ভালভাবে লেগে থাকবে।

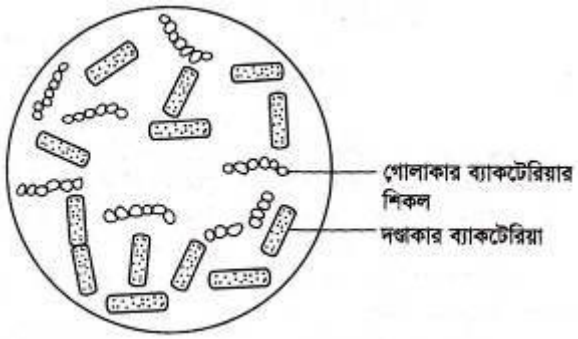

চিত্র ৬.৫.১ : দন্ডাকার ও গোলাকার ব্যাকটেরিয়া (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা)

(ঙ) এরপর স্লাইডের উপর শুকনা নমুনাতে স্যাফ্রানিন দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দিন ও ২-৩ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা পরিস্কার পানি ঢেলে দিন। এতে অতিরিক্ত স্যাফ্রানিন পানির সাথে চলে যাবে। পানি ঢালার কিছুক্ষণ পর স্লাইডটি শুকিয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্লাইডটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হলো।

পর্যবেক্ষণ : প্রস্তুতকৃত স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অবজেকটিভ এর নিচে রেখে নিরীক্ষণ করুণ। এসময় লাল রঙে রঞ্জিত দন্ডাকার ও গোলাকার ব্যাটেরিয়া দেখতে পাবেন।

সিদ্ধান্ত : টক দইয়ে দন্ডাকার ও গোলাকার ব্যাকটেরিয়া থাকে।

চিত্র অঙ্কন : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা চিত্রটি ব্যবহারিক খাতায় যথাযথভাবে আঁকুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

চিত্রটি লক্ষ করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

(ক) ব্যাকটেরিয়া কী ?

(খ) ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যকার প্রধান দুটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(গ) পাশে উল্লিখিত জীবটি কোন জাতীয় এবং এদেরকে কয়টি অধিরাজ্যে ভাগ করা হয়েছে, উল্লেখ করুন ?

(ঘ) পাশে উল্লিখিত অণুজীবের একটি গণ কীভাবে ব্লাইট রোগ সৃষ্টি করে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ক ২। ক